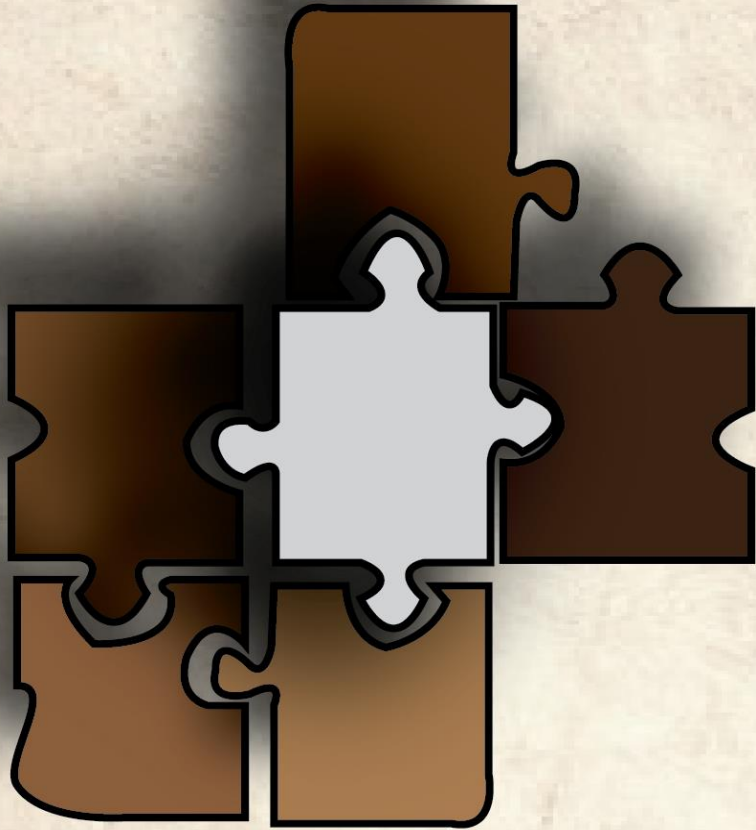


মেহত্বের প্রাথমিক বোঝাপড়া

(পারিবারিক, পেশাগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের জন্য)



ড. মুনির উদ্দিন আহমেদ (বাদল)

নেতৃত্বের প্রাথমিক বোঝাপড়া

ড. মুনির উদ্দিন আহমেদ (বাদল)

প্রকাশকের কথা

নেতা ও নেতৃত্ব নৌকার মাঝির সাথে তুলনীয়। মাঝিবিহীন নৌকার মতোই সঠিক নেতৃত্বহীন সমাজ ইম্পিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে হেঁচট খায়। সংঘবদ্ধতার ধারণা থেকেই সমাজব্যবস্থার গোড়াপত্তন। নেতৃত্ব ছাড়া সংঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ সমাজব্যবস্থার কাঠামো কল্পনা করা যেতে পারে; কিন্তু বাস্তবে তার কোনো ভিত্তি নেই। জীবনের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকা খুবই স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। একটি সুন্দর পৃথিবীর জন্য অপরিহার্য শর্ত হলো কার্যকর ও অনন্য নেতৃত্ব। বর্তমান সংকটাপন্ন পৃথিবী সত্যিকারার্থেই কাঙ্ক্ষিত নেতৃত্বের জন্য হাহাকার করছে। বিরাট সম্ভাবনার প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশও আজ যোগ্য নেতৃত্বের ডাক শুনতে অপেক্ষার প্রহর গুনছে।

সর্বত্রই নেতৃত্বের সংকট ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। সংকট উত্তরণের প্রথম ধাপ নেতৃত্ব সম্পর্কে বিশদ ধারণা ও অধ্যয়ন। নেতৃত্ব কী, কেন ও কীভাবে— খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। প্রচলিত ধারণা নেতৃত্বকে রাজনীতির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। অথচ নেতৃত্ব নামক বিশাল বটবৃক্ষের শত ডালের একটি পাতা রাজনৈতিক নেতৃত্ব। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা প্রত্যেকেই নেতৃত্বের আসনে বসে আছি; কিন্তু অসচেতনভাবে এই অঘোম সত্য উপেক্ষা করে চলি। অস্ট্রেলিয়ার ‘সুইনবার্ন ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি’ থেকে পিএইচডি করা নেতৃত্ববিষয়ক গবেষক ড. মুনির উদ্দিন আহমেদ (বাদল) ‘নেতৃত্বের প্রাথমিক বোঝাপড়া’ বইটিতে নেতৃত্ব সংক্রান্ত মৌলিক কথাগুলোর নির্ধারিত টেনেছেন। নেতৃত্ব অধ্যয়নে বইটি প্রারম্ভিক যাত্রা মাত্র। লেখক বইটিতে সংকটের সাথে করণীয় বাতলে দিয়ে সমাধানের পথে হেঁটেছেন। বইটি সকল শ্রেণি-পেশার পাঠকদের নেতৃত্বের প্রাথমিক বোঝাপড়ার ব্যাপারে দারুণ সহায়তা করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বইটি প্রকাশ করতে পেরে ‘গার্ডিয়ান পাবলিকেশন’ গর্বিত। সম্মানিত লেখক আমাদের প্রতি আস্থা রেখেছেন বলে আমরা কৃতজ্ঞ। আশা করছি, বইটি বাংলা সাহিত্যে নেতৃত্ববিষয়ক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা এনে দিবে।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের

বাংলাবাজার, ঢাকা।

১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৭

লেখকের কথা

পিএইচডি করার সময় ‘Learning Employment Aptitudes Program’ (LEAP)-এর আওতায় ‘Leadership and Communication’-এর ওপর অনলাইন কোর্স করার সুযোগ আসে। ‘Certificate of Participation’-এর পাশাপাশি এই কোর্স করতে গিয়েই আগ্রহ তৈরি হয় নেতৃত্ব নিয়ে পড়াশোনার। সেই পড়াশোনা থেকেই নেতৃত্ববিষয়ক বোঝাপড়া এবং তার ফলাফল এই বই।

বাসা-বাড়িতে, অফিস-আদালতে, চায়ের দোকানে, রাস্তার মোড়ে দেশ নিয়ে; আলোচনা, আড্ডা ও বিতর্কে নেতা ও নেতৃত্ব নিয়ে তুমুল আলোচনা হয়। বলা হয়, নেতা ও নেতৃত্বের মানের ওপর ব্যক্তি, পরিবার, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও দেশের উন্নয়ন নির্ভর করে। সামগ্রিক অগ্রগতি নিশ্চিত করতে উন্নত নেতৃত্ব পূর্বশর্ত। নেতৃত্ব সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষের ধারণা হচ্ছে নেতা জন্মায়। তাই একজন উন্নতমানের নেতার আশা ও প্রার্থনায় ভুক্তভোগীদের অপেক্ষার প্রহর গুনতে দেখা যায়। আবার নেতা বলতে অনেকেই কেবল রাজনীতিবিদদের বুঝি। নেতা আর নেতৃত্ব সম্পর্কে ভুল ধারণা সর্বত্র। নেতৃত্ব সম্পর্কে নানান ভুল ধারণা দূর করার পাশাপাশি নেতৃত্বের উপাদান, ধরন ও উন্নয়ন সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান বাংলা ভাষায় বোধগম্য করার প্রয়াসেই ‘নেতৃত্বের প্রাথমিক বোঝাপড়া’ নামের এই বইয়ের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

বইটি লেখার বিভিন্ন পর্যায়ে যারা উৎসাহ জুগিয়েছেন; বিশেষ করে আমার সব কর্মের গঠনমূলক সমালোচক সহধর্মিণী ড. মোহসিনা হক, বাবা, ভাই-বোন এবং বইয়ের পাণ্ডুলিপি পড়ে যারা মূল্যবান মতামত দিয়েছেন (একমাত্র ভাবি, ছোট ভাইয়ের বউ, ভায়রা ভাই রুমেল, বন্ধু কালাম, বন্ধু ফজলু ও তাঁর সহধর্মিণী, ড. রেজওয়ান, মুজাহিদ, মোস্তাক, সহকর্মী শাকিলা, এখলাস, মাহমুদ ও হাসিবসহ) সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ। বইটি প্রকাশ করার দায়িত্ব নিয়ে সময়ের আলোচিত ‘গার্ডিয়ান পাবলিকেশন’ আমাকে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। আল্লাহ সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন এবং উন্নত বাংলাদেশ গঠনে এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

ড. মুনির উদ্দিন আহমেদ (বাদল)

ঢাকা, ২০ আগস্ট, ২০১৭

muahmed1977@gmail.com

সূচিপত্র

নেতৃত্ব কী এবং কেন	১৫
নেতা কে.....	১৫
নেতৃত্ব কী.....	১৫
নেতৃত্ব কেন.....	১৭
কে নেতা.....	১৯
নেতৃত্বের দায়িত্ব	১৯
নেতৃত্ব বোঝার উপায়	২২
নেতা ও অনুসারী	২৩
নেতার মৌলিক দায়িত্ব	২৬
লক্ষ্য অর্জন করা	২৬
ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা.....	৩০
অনুসারীর প্রয়োজন পূরণ করা.....	৩০
নেতৃত্বের উপাদান.....	৩১
এক. গুণাগুণ	৩১
দুই. দৃষ্টিভঙ্গি	৩৭
তিন. দক্ষতা	৩৮
চার. মূল্যবোধ.....	৪৬
নেতৃত্বের প্রভাব উৎস.....	৫০
আমলাতান্ত্রিক উৎস- পদের প্রভাব	৫০
নৈতিক উৎস- চারিত্রিক গুণাবলি.....	৫০
যান্ত্রিক উৎস- তথ্য ও জ্ঞান	৫১
ব্যক্তিগত সম্পর্ক	৫১
আর্থিক উৎস.....	৫১
মানুষকে প্রভাবিত করার কিছু কৌশল	৫২

মানুষকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার মৌলিক নীতি	৫২
মানুষকে পরিবর্তন করার কৌশল	৫৫
নেতৃত্বের স্তরসমূহ	৫৭
প্রথম স্তর: পদ-নির্ভর নেতৃত্ব	৫৮
দ্বিতীয় স্তর: সম্পর্ক-নির্ভর নেতৃত্ব	৬২
তৃতীয় স্তর: উৎপাদন-নির্ভর নেতৃত্ব	৬৪
চতুর্থ স্তর: দান-প্রতিদান নির্ভর নেতৃত্ব	৬৬
পঞ্চম স্তর: মূল্যবোধ ও চরিত্র-নির্ভর নেতৃত্ব	৬৮
নেতৃত্বের ধরন, পরিণতি ও ফলাফল	৭২
এক. মানবিক নেতৃত্ব	৭২
দুই. গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব	৭৪
তিন. স্বেচ্ছাচারী নেতৃত্ব	৭৫
চার. হালছাড়া নেতৃত্ব.....	৭৭
বিভিন্ন পেশায় নেতৃত্বের প্রাসঙ্গিকতা.....	৭৯
পরিচ্ছন্নতায় নেতৃত্ব	৭৯
কম্পিউটিং-এ নেতৃত্ব	৮০
শিক্ষকতায় নেতৃত্ব	৮১
ডাক্তারিতে নেতৃত্ব	৮১
ইঞ্জিনিয়ারিং-এ নেতৃত্ব	৮৩
প্রশাসনে নেতৃত্ব	৮৩
পুলিশে নেতৃত্ব	৮৪
ব্যবসায় নেতৃত্ব	৮৫
রক্ষণ পেশায় নেতৃত্ব	৮৫
শিল্প প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব	৮৬
গবেষণায় নেতৃত্ব	৮৭
সাংবাদিকতায় নেতৃত্ব	৮৭
সামরিক বাহিনীতে নেতৃত্ব	৮৮
কৃষিতে নেতৃত্ব.....	৮৯

হিসাবরক্ষণ ও ব্যাংকিং পেশায় নেতৃত্ব	৯০
গৃহে নেতৃত্ব	৯১
নেতৃত্বের উন্নয়নে মা-বাবা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা	৯৩
নেতৃত্বের উন্নয়ন কেন সম্ভব.....	৯৩
নিজস্ব নেতৃত্বের মান উন্নয়ন	৯৪
নিজের নেতৃত্বের মান ক্রমাগত উন্নয়নে করণীয়	৯৫
সন্তানের নেতৃত্বের মান উন্নয়নে মা-বাবার করণীয়	৯৬
সন্তানের যেসব আচরণের দিকে নজর রাখতে হবে	১০০
সন্তানকে আত্মবিশ্বাসী করা	১০০
সন্তানকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে করণীয়.....	১০০
সন্তান যেন হীনমন্যতায় না ভোগে	১০২
সন্তানের সাথে মানুষের সম্পর্ক.....	১০৩
দলবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারছে তো	১০৩
পরামর্শ করার অভ্যাস	১০৩
লেগে থাকার অভ্যাস গড়ে উঠছে তো	১০৪
আর্থিক বুদ্ধিমত্তা	১০৪
সৃজনশীলতার বিকাশ	১০৫
সময়ের মূল্যবোধ তৈরি.....	১০৫
সন্তানের অভ্যাস	১০৫
বাজে অভ্যাস গড়ে উঠা থেকে বিরত রাখা.....	১০৭
ছাত্র-ছাত্রীর নেতৃত্ব বিকাশে শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ...	১০৭
নেতৃত্বের উন্নয়ন.....	১১১
রাজনৈতিক নেতৃত্বের উন্নয়ন	১১১
সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা	১১১
সমস্যা সমাধানের দক্ষতা	১১৫
সমস্যাকে কী সহজতর উপায়ে চিহ্নিত করা হয়েছে	১১৭
সমস্যার সমাধান	১১৭
সাংগঠনিক দক্ষতা.....	১১৭
যোগাযোগের দক্ষতা.....	১১৮

নেতার ব্যক্তিগত লক্ষ্য.....	১১৯
মানুষের প্রতি রাজনীতিবিদের দৃষ্টিভঙ্গি.....	১২০
সংকটে করণীয় ও ভালো নেতৃত্বের লক্ষণ.....	১২২
সংকটময় সময় নেতৃত্বের করণীয়	১২২
পরিস্থিতির বিশ্লেষণ.....	১২৩
সংযোগ ও সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধি.....	১২৩
মূল্যবোধ, পরিবেশ, সংস্কৃতি আর ভিশন উপস্থাপন.....	১২৪
করণীয় নির্ধারণ	১২৪
দৃশ্যমান অবস্থান	১২৪
প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বর্জনীয়	১২৫
উন্নত নেতার কয়েকটি লক্ষণ	১২৫
বিবিধ.....	১২৮
নেতা জন্মে নাকি তৈরি হয়	১২৮
নেতৃত্ব ও জীবনের সফলতা.....	১২৯
নেতৃত্বের পরিপ্রেক্ষিত নির্ভরতা.....	১২৯
নেতৃত্ব এবং ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স	১৩০
৩৬০ ডিগ্রি লিডারশিপ	১৩১
সামগ্রিক নেতৃত্ব	১৩২
নেতৃত্ব ও সম্মোহনী ক্ষমতা	১৩২
বস বনাম নেতা	১৩৩
অন্যের নেতৃত্বের উন্নয়ন হলে লাভ কী	১৩৪
নেতৃত্ব ও মাতৃভাষা	১৩৫
পরিবারে নেতৃত্বের স্তর	১৩৬
সমাপ্তি.....	১৩৭
নেতৃত্ব নিয়ে মনীষীগণের অমিয় বাণীসমূহ.....	১৩৮
নেতৃত্বের প্রাথমিক বোঝাপড়ার উৎসসমূহ	১৪২

নেতৃত্ব কী এবং কেন

নেতা কে

‘নেতা’ শব্দটি উচ্চারণ করলেই অধিকাংশের মানসপটে রাজনীতিবিদের ছবি ভেসে ওঠে। নেতার প্রতীকী চরিত্র যেন রাজনীতিবিদ। যদি প্রশ্ন করা হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কি নেতা নন? উত্তর হবে হ্যাঁ, তিনি নেতা। তিনি একাডেমিক নেতা। একজন ডাক্তার যিনি হাসপাতাল পরিচালনা করেন, তিনি কী? তিনি হাসপাতালের ডাক্তারদের নেতা। একটি হাসপাতালের সকল নার্সদের যিনি পরিচালনা করেন, তিনি? তিনি নার্সদের নেতা। কোনো প্রতিষ্ঠানের পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের যিনি প্রধান, তিনি কি নেতা নন? হ্যাঁ, তিনি পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের নেতা। একইভাবে পরিবারের প্রধান পারিবারিক নেতা। একজন প্রকৌশলী যার অধীনে অনেক প্রকৌশলী কাজ করে; রেস্টুরেন্টের বাবুর্চি যে কয়েকজন সহযোগী নিয়ে রান্না করে থাকে, একটি উপজেলার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলার প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা, তারা প্রত্যেকেই একেকজন নেতা। নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে নেতা। যিনি দেশের সরকার প্রধান, তিনি সকলের নেতা।

যদি প্রশ্ন করা হয়, চোরের দলের সর্দার কে? উত্তর হবে চোরের দলের নেতা। ডাকাত দলের সর্দার? সে ডাকাত দলের নেতা। তাহলে নেতা নয় কে? আসলে আমরা প্রত্যেকেই নেতা হিসেবে কোনো না কোনো ভূমিকা পালন করে থাকি। ঘরে-বাহিরে, কর্মক্ষেত্রে, কোথাও না কোথাও আমরা সবাই নেতা। একজন মানুষকে কোনো লক্ষ্য অর্জনে পরিচালিত করার দায়িত্ব যার কাঁধে, তিনিই নেতা। এটা কোনো প্রশ্ন হতে পারে না, আপনি-আমি নেতা কিনা! প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কে কেমন নেতা, ভালো নেতা নাকি খারাপ নেতা।

নেতৃত্ব কী

নেতা যা করেন এবং যা করা উচিত, তা করার যোগ্যতা ও সামর্থ্যের নামই হচ্ছে নেতৃত্ব। প্রশ্ন হচ্ছে, নেতা কী করেন এবং কী করা উচিত? প্রত্যেক নেতাই কোনো না কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করেন। রাজনৈতিক নেতা রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য, প্রশাসনিক নেতা প্রশাসনিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য, চোরদের নেতা চুরির লক্ষ্য অর্জনের জন্য, ডাকাতদের নেতা ডাকাতির লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করে থাকেন। খেলোয়াড়দের নেতা ম্যাচ

জেতানোর জন্য, স্বেচ্ছাসেবক ক্লাবের নেতা স্বেচ্ছাসেবী সংশ্লিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য, একাডেমিক নেতা একাডেমিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করেন। এভাবে সব নেতাই নিজ নিজ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করে যান। লক্ষ্য অর্জনে নেতৃত্বের গুরুত্ব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

তবে কোনো মানুষই একা একা খুব বেশি কিছু করতে পারে না। অন্যদের সহযোগিতা নিতে হয়, কাজে লাগাতে হয়। বিশেষ করে বড় কিছু করতে গেলে সহযোগী হিসেবে কাউকে না কাউকে পাশে দরকার হয়। নেতা সব সময়ই বড় কিছু করতে মুখিয়ে থাকে। তাই লক্ষ্য স্থির করার সাথে সাথে তা অর্জনে নেতাকে নিজের সাথে অন্য অনেক মানুষকে জড়িত করতে হয়, উৎসাহিত করতে হয় এবং ধরে রাখতে হয়। সহযোগীদের অপ্রয়োজনীয় কাজ থেকে বিরত রেখে প্রয়োজনীয় কাজে সম্পৃক্ত রাখতে হয়। অন্যদেরকেও লক্ষ্য অর্জনে প্রভাবিত করতে হয়। এখানে প্রভাবিত করার অর্থ দুটি। প্রথমত, একদিকে ভালো ও প্রয়োজনীয় কাজে উৎসাহিত করা। দ্বিতীয়ত, খারাপ ও অন্যায্য কাজ থেকে বিরত রাখা। এ দুটি ব্যাপারে মানুষকে প্রভাবিত করার যোগ্যতা, দক্ষতা ও ক্ষমতা না থাকলে নেতৃত্বে সফল হওয়া অনেক কঠিন।

সমাজের যেকোনো জায়গায়, যেকোনো পরিস্থিতিতে যখন কাউকে নেতার ভূমিকা পালন করতে হয়; তখন তাকে কোনো একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য মানুষকে প্রভাবিত করতে হয়। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নেতা ও নেতৃত্ব ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে কাজ করেন। কিন্তু সব ধরনের পরিস্থিতিতেই নেতা সাময়িক ও সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য স্থির করে কাজ করার সামর্থ্য রাখেন।

তাই নেতৃত্বকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়, ‘নেতৃত্ব হচ্ছে লক্ষ্য অর্জনে কর্মসম্পাদনের জন্য মানুষকে প্রভাবিত করার সামর্থ্য ও যোগ্যতা।’ আর যিনি লক্ষ্য স্থির করেন, লক্ষ্য অর্জনে মানুষকে প্রভাবিত করেন, তিনিই নেতা। ইংরেজিতে এভাবে বলা যায়- ‘Leadership is the ability to influence people (including self) to act to achieve goal/s’. এক কথায় নেতৃত্ব হচ্ছে প্রভাব। ইংরেজিতে যাকে বলে ‘Influence’। যদিও অনেক সময় আমরা শুধু পদকে (সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক) নেতৃত্ব মনে করি; কিন্তু প্রভাব না থাকলে শুধু পদ দিয়ে কাজ করা সম্ভব হয় না। যদিও পদ থাকলে কিছু প্রভাব সৃষ্টি হয়।

অন্যদিকে পদ ছাড়া শুধু প্রভাব দিয়েও কাজ করানো সম্ভব হয় না। পদ ছাড়াই যারা প্রভাবিত করতে পারেন বা নেতৃত্ব দিতে পারেন, তারাই হচ্ছেন উন্নতমানের নেতা। এটা হচ্ছে, নেতৃত্বের একটি নৈতিকতা ও পরিপ্রেক্ষিত নিরপেক্ষ কারিগরি (Technical) সংজ্ঞা। যেকোনো পরিস্থিতিতে ভালো-খারাপ দু’ধরনের নেতৃত্বের ক্ষেত্রেই এই সংজ্ঞা প্রযোজ্য। যিনি

নৈতিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য নেতা হওয়ার লক্ষ্য অর্জনে কাজ করেন, তিনি ভালো নেতা। আর যিনি নৈতিক দিক প্রাধান্য না দিয়ে যেনতেন উপায়ে কাজ করেন, তিনি অগ্রহণযোগ্য (খারাপ) নেতা। যেমন : চোর-ডাকাতদের নেতা, কোনো গণহত্যায় নেতৃত্বদানকারী নেতা। অন্যদিকে, লক্ষ্য অর্জনে একজন নেতা কী ধরনের পস্থা অবলম্বন করেন, তার ওপরও নেতৃত্বের নৈতিক মান নির্ভর করে। ভালো কাজে সফলতা অর্জনের লক্ষ্য নেতার গৃহীত পদ্ধতি ও কর্মপস্থা যদি নৈতিক দিক থেকে অগ্রহণযোগ্য হয়, তবে তাকেও ভালো নেতা হিসেবে গণ্য করা যায় না।

নেতৃত্বের একটি সংখ্যাগত সংজ্ঞা দেয়াও সম্ভব। কারণ, লক্ষ্য অর্জনে নেতাকে অন্যদের প্রভাবিত করতে হয়। লক্ষ্যের বিশালতার ওপর ভিত্তি করে ন্যূনতম একজন থেকে শুরু করে লাখো মানুষকে প্রভাবিত করা সম্ভব। নেতা যাদেরকে প্রভাবিত করেন, যারা নেতার দ্বারা প্রভাবিত হন, তারা হচ্ছেন অনুসারী। ইংরেজিতে বলা হয় ফলোয়ার (Follower)। ‘ন্যূনতম একজন মানুষকে কোনো লক্ষ্য অর্জনে প্রভাবিত করাই নেতৃত্ব’ এবং ‘যার মাত্র একজন অনুসারীও আছে তিনিই নেতা’।

নেতৃত্ব কেন

ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও পেশাগত জীবনকে চলমান রাখতে মানুষকে অনেক কাজ করতে হয়। পেশা যা-ই হোক না কেন, পেশা মাত্রই অনেক ধরনের কাজ; সব কাজের ধরন এক নয়। এসব কাজকে দুভাগে ভাগ করা যায়। কিছু কাজ নিজ হাতে করা যায়। আর কিছু কাজ অন্যকে দিয়ে করিয়ে নিতে হয়। স্বভাবতই সব কাজ একা নিজ হাতে করা যায় না। কারণ—

- একজন মানুষ সব কাজে দক্ষ হতে পারে না।
- একাধিক কাজে দক্ষ হলেও সব কাজ একাই করতে ভালোবাসে না।
- একের অধিক কাজ ভালোবাসলেও একজন মানুষ একসাথে সব কাজ করতে পারে না এবং সব কাজ করার পর্যাপ্ত সময়ও থাকে না।

সব ক্রিকেটার অল-রাউন্ডার হয় না। আবার যে অল-রাউন্ডার ক্রিকেটার, সে একসঙ্গে ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং সবকিছু সমানভাবে উপভোগ করে না। এমনকী উপভোগ করলেও একসাথে সব কাজ করা সম্ভব নয়। একই সময়ে একাধিক স্থানে দৈহিক উপস্থিতি সম্ভব নয়।

আমরা কেউ এই জীবনে একা চলতে পারি না। প্রাত্যহিক জীবন থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাজের জন্য আমাদের কোনো না কোনো মানুষের ওপর নির্ভর করতে হয়। অন্যদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হয়। অন্যদের কাজ করিয়ে নিতে হলে লক্ষ্য স্থির করে দিতে হয়। কী করতে হবে, তা বুঝিয়ে দিতে হয়। সর্বোপরি সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাদেরকে পরিচালনা করতে জানতে হয়। আর মানুষকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে প্রভাবিত করার সামর্থ্যের নামই হচ্ছে নেতৃত্ব। অর্থাৎ ঘরে-বাইরে, অফিস-আদালতে সব জায়গায় আমাদের জীবনের প্রাত্যহিক কাজ করানো নেতৃত্বের মানের ওপর নির্ভর করে। যেমন : আমাদের বাসা-অফিস কতটুকু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে, তা নির্ভর করে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের থেকে কত ভালোভাবে কাজটি করিয়ে নিতে পারছি। বাসার দারোয়ান বাড়ি পাহারার কাজ কত ভালোভাবে করবে, তা নির্ভর করে অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে কতটুকু প্রভাবিত করতে পেরেছি। বাসার বাবুর্চির রান্না-বান্নাসহ অন্যান্য কাজগুলো কেমন হবে, তা নির্ভর করে তাকে আমরা কতটুকু প্রভাবিত করতে পেরেছি। কেউ কোনো কাজ ভালোভাবে করতে জানলেই কেবল কাজ করে না, তাকে সেই কাজে উদ্বুদ্ধ করতে হয়। আর উদ্বুদ্ধকরণ নির্ভর করে নিয়োগকর্তার নেতৃত্বের মানের ওপর। এমনিভাবে আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাফল্য নির্ভর করে নেতৃত্বের মানের ওপর।

সময়ের স্বল্পতা ও নিজস্ব সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতাকে দূর করে সফল হতে হলে সর্বোচ্চমানের নেতৃত্ব প্রয়োজন। পেশাগত জীবনের সাফল্যও নেতৃত্বের মানের ওপর নির্ভর করে। আমরা যত ভালোভাবে আমাদের অধীনস্থ লোকদের মাধ্যমে কাজ করিয়ে নিতে পারব, তত বেশি সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে পারব। তাই বলা যায়, ‘আমাদের জীবনের সুখ ও সফলতার জন্য নেতৃত্বের সামর্থ্য অপরিহার্য; সুখ ও সফলতা আমাদের নেতৃত্বের মানের সমানুপাতিক’।

কে নেতা

সোজা উত্তর, আমরা সবাই নেতা। আমাদের সবারই লক্ষ্য অর্জনে নিজেকে এবং অন্যকে প্রভাবিত করার দায়িত্ব রয়েছে। সৃষ্টিকর্তা উদ্দেশ্য ছাড়া এমনি এমনি আমাদের সৃষ্টি করেননি। অবশ্যই কিছু না কিছু লক্ষ্য পূরণ করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। তাই নিজেকে সে লক্ষ্যে চালিত, প্রভাবিত ও উৎসাহিত করার দায়িত্ব প্রত্যেকেরই রয়েছে। শুধু দায়িত্ব নয়, আমাদের কম-বেশি দক্ষতাও আছে, আছে বিশেষ কিছু গুণাবলিও। ফলে আমরা সবাই কমবেশি অন্যকে কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে প্রভাবিত করতে পারি। দায়িত্ব ও সামর্থ্যের দিক থেকে আমরা সবাই নেতা (By ability and responsibility, we all are leaders)।

নেতৃত্বের দায়িত্ব

ইতোমধ্যে স্পষ্ট হয়েছে, আমাদের সবারই নেতৃত্বের দায়িত্ব রয়েছে। রয়েছে নেতৃত্ব দেয়ার সামর্থ্যও। নেতৃত্বের এই দায়িত্বকে দুভাগে ভাগ করা যায়। এক প্রকার দায়িত্ব বাধ্যতামূলক, আরেক প্রকারের দায়িত্ব ঐচ্ছিক।

এক. বাধ্যতামূলক নেতৃত্ব

- **ব্যক্তিগত নেতৃত্ব** : নিজের জীবনকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করার দায়িত্ব প্রত্যেকের আপন কাঁধেই বর্তায়। একে ব্যক্তিগত নেতৃত্ব বলে। কোনো মানুষই ব্যক্তিগত নেতৃত্ব থেকে মুক্ত নয়। যেসব ব্যক্তির সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে, তাদের ক্ষেত্রে বলা হয় ‘লাইফ লিড’ করছে (Leading life)। আর যাদের জীবনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই, তারা ‘জীবনযাপন’ করছে (Living life)। লক্ষ্য ছাড়া জীবন ঠিক যেন মাঝি ছাড়া নৌকার মতো। যেকোনো সময় এই নৌকা থেমে যেতে পারে কিংবা এলোমেলো অথবা উল্টাপাল্টা পথে চলতে পারে। তাই ব্যক্তিগত জীবনে অবশ্যই লক্ষ্য স্থির করতে হবে। মানুষের জীবনের অন্যতম লক্ষ্য; সুখী এবং পরিতৃপ্ত হওয়া। তবে সুখ ও পরিতৃপ্তি ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়। ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ এবং বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ভিন্নতায় সুখ ও তৃপ্তিও ভিন্ন হয়। শুধু জীবন ও মৃত্যু পর্যন্ত যাদের বিশ্বাস, তাদের লক্ষ্য শুধু এই পার্থিব জীবনে সুখী ও পরিতৃপ্ত হওয়া। আর যারা মৃত্যুর পরের জীবনে বিশ্বাস করেন, তারা সেই জীবনেও সুখী ও পরিতৃপ্ত হতে চান। আর সে কারণে তারা স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনকে অপরিহার্য মনে করেন। স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জন করতে তাঁর নির্দেশিত বিধানগুলো পালন করেন এবং সৃষ্টির সেবা করেন। স্রষ্টার নির্দেশিত বিধানগুলো (যারা এক স্রষ্টায় বিশ্বাস করেন) সবার জন্য একই। তবে সৃষ্টির সেবা করার ভিন্ন উপায় রয়েছে।

ডাক্তার, শিক্ষক, প্রকৌশলী, পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবেও সৃষ্টির সেবা করা যায়। তাই এসব পেশা হচ্ছে সৃষ্টির সেবার মাধ্যম ও স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম। তবে এসব মাধ্যমে কাজ করতে গিয়ে ব্যক্তিজীবনে আমাদের অনেক চাহিদা পূরণ হয়। জীবন ধারণের জন্য যে অর্থ প্রয়োজন হয়, তা পূরণ হয়। সেই সাথে পদ-সম্মানও পাওয়া যায়। তাই ব্যক্তিগত জীবনে লক্ষ্য স্থির করতে হলে প্রথমেই স্থির করে নিতে হবে; কোন পেশাকে অবলম্বন করে জীবনে সুখ ও পরিতৃপ্তি অর্জন করা যাবে।

মনে রাখতে হবে, পেশা হচ্ছে লক্ষ্য অর্জনের উপায় বা মাধ্যম। মাধ্যমকেই ইস্পিত লক্ষ্য মনে করলে ভুল হবে। যেমন: ডাক্তার, প্রকৌশলী, বিসিএস ক্যাডার, রাজনীতিবিদ হওয়া কারও জীবনের লক্ষ্য হতে পারে না; বরং লক্ষ্য হওয়া উচিত মানবসেবা। সেই লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম হতে পারে যেকোনো পেশা। এসব মাধ্যম আবার জীবনের অন্যান্য চাহিদা পূরণের মাধ্যমও বটে। লক্ষ্য যখন স্রষ্টার সন্তুষ্টি, তখন আনুষ্ঠানিক ইবাদাত আর মানবসেবা হচ্ছে সে লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম। স্থির লক্ষ্য অর্জন করতে হলে অবশ্যই লক্ষ্য ও মাধ্যমের এই আন্তঃসম্পর্ক খুব ভালোভাবে বোঝতে হবে। এই বিষয়টা স্পষ্ট না হওয়ায় অনেকেই মাধ্যমকে লক্ষ্য মনে করে ছুটতে থাকে। শেষে অসুখী ও অতৃপ্ত অবস্থায় মৃত্যুকে বরণ করতে হয়।

আবার এই বিষয়টাও স্পষ্ট হওয়া দরকার যে, লক্ষ্য অর্জনে আন্তরিকতার সাথে কাজ করলে উৎপাদন (By Product) হিসেবে অনেক কিছুই পাওয়া যায়। যেমন : কোনো ডাক্তার যদি আন্তরিকতার সাথে রোগীর সেবা করেন, তবে সেবার সাথে তিনি অর্থ উপার্জনও করতে পারবেন। অর্থ নিয়ে তাকে চিন্তা করতে হবে না। মানুষের ভালোবাসা, দোয়া এবং স্রষ্টার সন্তুষ্টিও পাওয়া যাবে। কিন্তু অর্থ উপার্জনকে যদি লক্ষ্য করা হয় আর সব মনোযোগ যদি সেদিকেই থাকে, তাহলে হয়তো অর্থ আসবে; বিনিময়ে অনেক কিছুই তখন হারাতে হবে। একই কথা অন্য পেশার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ‘লাইফ লিড’ করতে হলে আমাদেরকে লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে। জীবনের চূড়ান্ত ও আপাত লক্ষ্যগুলো স্থির করতে হবে। লক্ষ্যে পৌঁছার মাধ্যম ঠিক করতে হবে এবং লক্ষ্যে স্থির থেকে সঠিক মাধ্যমে জীবন পরিচালিত করতে হবে।

- **পারিবারিক নেতৃত্ব :** একটি সুখী সমৃদ্ধ পরিবার গড়ে তোলার দায়িত্ব সবারই। এমনকী কেউ যদি নিজে বিয়ে করে পরিবার গঠন নাও করে, তবুও তাকে নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করতে হয়। যে পরিবারে তার জন্ম, সে পরিবারে অবশ্যই তার নেতৃত্বের দায়িত্ব রয়েছে। ছোট হোক বা বড় হোক দায়িত্ব রয়েছেই যায়। পারিবারিক নেতৃত্ব যত সুদৃঢ় ও দক্ষ হয়, সে পরিবার তত বেশি গুছানো হয়। দুর্বল নেতৃত্বের পরিবারে নানামাত্রিক সংকট দেখা যায়। আপনি আপনার চোখ বন্ধ করে নিজের

পরিবারের দিকে তাকিয়ে দেখুন। নিজ পরিবার থেকেই নেতৃত্বের ব্যাপারে একটা ভালো ধারণা পেয়ে যাবেন। পারিবারিক নেতৃত্বের দায়িত্বও বাধ্যতামূলক।

- **পেশাগত নেতৃত্ব** : জীবন ধারণ করতে প্রত্যেক মানুষকে কোনো না কোনো পেশা বেছে নিতে হয়। আর কোনো পেশায় একা একা কাজ করা যায় না। একা কাজ করে খুব বেশি কিছু করাও যায় না। বড় কোনো সাফল্যও আসে না। এমনকী গায়ক-গায়িকা, শিল্পীদেরও একটি দলের (গানের দল, নাচের দল) প্রয়োজন পড়ে। সে দলের একজনকে নেতৃত্ব দিতে হয়। একা একা ফিল্মিং করেও খুব বেশি কিছু করা যায় না। দল গড়ে প্রশিক্ষণ দিতে হয়। সাফল্য অর্জনের জন্য দলের নেতৃত্ব দিতে হয়। পেশাগত জীবনে নেতৃত্বের মূল প্রভাবক অত্যন্ত দৃশ্যমান। যে পেশায় যত বেশি নেতৃত্বের অনুশীলন হয়, সে পেশায় তত বেশি ফলাফল পাওয়া যায়। তাই পেশাগত নেতৃত্বও বাধ্যতামূলক নেতৃত্ব।

দুই. স্বেচ্ছাসেবামূলক নেতৃত্ব

এ ধরনের নেতৃত্বের দায়িত্ব কাঁধে নেয়া বাধ্যতামূলক নয়। ফলে এই ধরনের নেতৃত্ব অপরিহার্য নয়, তবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

- **সামাজিক নেতৃত্ব** : সমাজে অনেক স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ হয়। এর জন্য বিভিন্ন সংগঠন কাজ করে। কেউ ইচ্ছা করলে এসব সংগঠনের নেতৃত্বের দায়িত্ব কাঁধে নিতে পারে। এ ধরনের সংগঠনে কাজ করে পাওয়া নেতৃত্ব গুণ অনেক কার্যকর হয়। কারণ, এখানে নেতার প্রভাবের উৎস হচ্ছে ব্যক্তিগত চরিত্র ও দক্ষতা। পদের প্রভাব ও অর্থের প্রভাব এখানে গৌণ বিষয়। কীভাবে চারিত্রিক গুণাবলিকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করা যায়, এ রকম সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে তা শেখার একটি ভালো সুযোগ থাকে। তাই কোনো না কোনো সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে নিজেদের এবং সন্তান-সন্ততিকে সম্পৃক্ত করা উচিত। আর কেউ একজন কেমন নেতা, সে ধারণা পাওয়ার একটি ভালো উপায় হচ্ছে, উনি কোনো স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দিয়েছেন কিনা; দিলে সেটা কেমন ছিল, তা যাচাই করে দেখা।
- **রাজনৈতিক নেতৃত্ব** : যদিও আমরা নেতা বলতে সাধারণত রাজনীতিবিদদেরই বুঝি। তবে নেতা হতে রাজনীতিবিদ হওয়া বাধ্যতামূলক নয়। কেউ চাইলে রাজনীতির সাথে জড়িত হতে পারেন বা রাজনৈতিক নেতৃত্বের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে পারেন।

এটা ঐচ্ছিক। তবে কাউকে না কাউকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতেই হবে। কারণ, রাজনীতি ছাড়া কোনো সমাজ ও রাষ্ট্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে না। রাজনৈতিক নেতৃত্ব এই অর্থে এক ধরনের সামাজিক নেতৃত্ব। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, পেশাগত এবং সামাজিক জীবনের নেতৃত্ব তথা লক্ষ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। একটি যেন অন্যটির সাথে সাংঘর্ষিক না হয়।

নেতৃত্ব বোঝার উপায়

আমরা সবাই নেতা। এ নিয়ে ভিন্ন মত হয়তো এখন আর কেউ করবেন না। প্রশ্ন হতে পারে, কে কেমন নেতা। ভালো নেতা, নাকি খারাপ নেতা? উন্নতমানের নেতা, নাকি মধ্যম মানের নেতা? নাকি গড়পড়তা মানের নেতা? কে কেমন নেতা, তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখলেই তা বোঝা যায়। যথা—

- লক্ষ্য।
- মানুষের জীবনে প্রভাব এবং প্রভাবিত করার পদ্ধতি।
- প্রভাবিত মানুষের মান ও সংখ্যা।

যে নেতার লক্ষ্য যত বড়, যত বেশি মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে, সে তত উঁচুমানের নেতা। মানুষের মাঝে তার প্রভাব এবং মানুষকে প্রভাবিত করার পদ্ধতি দেখে, তার নেতৃত্বের মান বোঝা যায়। একজন নেতা মানুষের জীবনকে গঠনমূলকভাবে প্রভাবিত করতে পারেন আবার বাজেভাবেও প্রভাবিত করতে পারেন। নেতার সিদ্ধান্ত ও কাজকর্মের কারণে যদি বেশি সংখ্যক মানুষের জীবন উন্নত হয়, তবে তিনি ভালো নেতা। আর যদি দেখা যায়, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের জীবন বিষিয়ে উঠছে, তাহলে তিনি ভালো নেতা বলে বিবেচিত হবেন না। মানুষকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করার পদ্ধতি থেকেও নেতৃত্বের মান বোঝা যায়। জানা দরকার ভয়, চাপ ও লোভ দেখিয়ে কি তিনি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন? নাকি তার যোগ্যতা ও দক্ষতা দিয়ে মানুষের ভূমিকা পালন করার অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষা আর কর্মোদ্যমকে জাগিয়ে তোলেন? এরপর নেতা কর্তৃক প্রভাবিত মানুষের গুণমান এবং সংখ্যার মাধ্যমেও নেতৃত্বের মান পরিমাপ করা যায়। উন্নতমানের নেতা শিক্ষিত, মার্জিত, সৃজনশীল এবং গুণমানে উন্নত মানুষজনকে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করেন।

অন্যদিকে, কত সংখ্যক মানুষকে নেতা প্রভাবিত করেন, তা থেকেও নেতার দক্ষতার প্রমাণ মিলে। কারণ, শুধু বড় লক্ষ্য স্থির করলেই হবে না, তা মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে ও বোধগম্য করে উপস্থাপন করতে হবে। তবে একজন নেতা কতজন মানুষের জীবনকে কত

ভালোভাবে বা কত খারাপভাবে প্রভাবিত করেন, তার ওপর নির্ভর করে একজন নেতার নেতৃত্বকে মূল্যায়ন করা যায়। অনেক ভালো কাজ করার পরও দু-চারজন মানুষের ওপর অন্যায় এবং দু-একটি বড় দুর্নীতির কারণে নেতার কপালে খারাপ নেতার তকমা জুটে যেতে পারে। জীবনের সমস্ত অর্জন ধুলোয় মিশে যেতে পারে। সব দেশেই এ রকম অনেক উদাহরণ আছে।

নেতা ও অনুসারী

নেতা-অনুসারীর সম্পর্কটা আপেক্ষিক। কেউ যেমন একদিনে নেতা হয় না, তেমনি একজন অনুসারী সব সময় সবার ক্ষেত্রে অনুসারী নন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেউ একজন যখন নেতা, তখন সে অন্য কোনো নেতার অনুসারীও বটে। একটি সংগঠনের সবচেয়ে নিচের সারির লোক ছাড়া বাকি সবাই একই সাথে নেতা ও অনুসারী। একই ব্যক্তি একজনের অনুসারী, আবার সেই ব্যক্তিই তার অনুসারীদের নেতা। আবার অনেক সময় দেখা যায়, যিনি উঁচু পদে আছেন তার জ্ঞান, দক্ষতা আর আত্মবিশ্বাসের তুলনায় তাঁর অধীনস্থদের মধ্যকার কেউ না কেউ এগিয়ে আছেন। ফলে শীর্ষপদে আসীন নেতা ইচ্ছা-অনিচ্ছায়, সচেতনে-অবচেতনভাবে অনেক সময় অনুসারীর ওপর নির্ভর করেন। তার মতামত, সিদ্ধান্ত ও পছন্দ-অপছন্দকে মূল্যায়ন করেন। পদের দিক থেকে যদিও উর্ধ্বতনই নেতা; কিন্তু এক্ষেত্রে কার্যত অনুসারীই নেতা।

তবে ভালো নেতা হতে হলে কাউকে না কাউকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হয়। ভালো অনুসারী সহজেই ভালো নেতা হতে পারেন। পারিবারিক নেতৃত্বে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অবশ্য হঠাৎ করেই যে কেউ শীর্ষ নেতৃত্বের আসন পেয়ে যান। অন্যদিকে সংগঠনের মধ্য সারির নেতারা শীর্ষ সারির নেতার অনুসারী। তাই নেতা হওয়ার জন্য যেসব বৈশিষ্ট্য দরকার, সেগুলো অনুসারীদেরকে সর্বাঙ্গে অর্জন করতে হয়। অনুসারীর বাড়তি যা দরকার তা হচ্ছে নেতার প্রতি আনুগত্য। সেই সাথে শীর্ষ নেতা থেকে শুরু করে নিচের স্তরের অনুসারী পর্যন্ত সকলকে সংগঠনের প্রতি অনুগত থাকতে হয়।

ভালো নেতা হতে হলে ভালো অনুসারী হওয়ার বিকল্প নেই। কারণ, নেতাকে যদি ভালোভাবে অনুসরণ করা যায়, তাহলে নেতৃত্বের গুণাবলি সহজেই অর্জন করা যায়। তবে নেতার নীতি, কর্মপন্থা ও কর্মপদ্ধতির সাথে একমত হতে না পারলে, সেই নেতার প্রতি অনুগত থাকা যায় না। সেক্ষেত্রে উচিত হবে, নেতার কাছ থেকে সরে আসা। চাকরিতে যদি এ রকম হয় সেক্ষেত্রে দ্রুত চাকরি পরিবর্তন করাই শ্রেয়। অন্যদিকে, অনুসারীদের

সাথে যদি নেতার সুষ্ঠু ও সুন্দর সম্পর্ক না থাকে, তবে নেতার পক্ষে ভালো কিছু করা সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রে নেতাকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করা উচিত। জায়গা ছেড়ে দেয়া উচিত।

একজন ভালো অনুসারী ততক্ষণ নেতাকে সমর্থন করেন, যতক্ষণ নেতা সঠিক কাজটি করেন। অন্যদিকে নেতা যখনই ভুল করেন, তখন তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভুল ধরিয়ে দেয়াই একজন ভালো অনুসারীর বৈশিষ্ট্য। তবে এমনভাবে বলতে হবে যেন নেতা ভুল না বুঝেন। আর তা করতে না পারলে নেতা ও অনুসারী উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। কারণ, নেতা যদি ভুল ধরতে না পারেন, তখন নেতার সাথে সাথে অনুসারীকেও সেই ভুল পথেই চলতে হয়। তাই নেতার উচিত এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা, যেন কোথাও কোনো ভুল হলে তা নেতার নজরে আনতে অনুসারীরা কখনো সংকোচ বোধ না করেন।

নেতা-অনুসারী সম্পর্কটা জটিল। এ ব্যাপারে কিছু দিক স্পষ্টভাবে বোঝা দরকার। আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি, সবারই নেতৃত্বের সামর্থ্য আছে। নেতা আর অনুসারীর মধ্যে জটিলতা তৈরি হয় তখনই, যখন দেখা যায় নেতার নেতৃত্বের মান অনুসারীদের থেকেও নিম্নমানের। এক্ষেত্রে তিন ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। একই রাস্তার একই লেনে চলমান ভিন্ন ভিন্ন গতির দুটি গাড়ির ক্ষেত্রে যেমনটি হয়।

সামনের গাড়ির গতি কম হলে, উচ্চগতির পেছনের গাড়ি সামনের গাড়িকে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। যদি যাওয়ার সেই সুযোগ না থাকে, তাহলে উচ্চগতির গাড়িকে গতি কমাতে হবে। তা না করতে পারলে সংঘর্ষ হবে ও দুর্ঘটনা ঘটবে। তেমনি অনুসারী যদি নেতা থেকেও যোগ্যতাসম্পন্ন হয়, সে ক্ষেত্রে অনুসারী নেতাকে পাশ কাটিয়ে উপরে উঠার চেষ্টা করবে। মানে চাকরির ক্ষেত্রে হলে, অনুসারী চাকরি ছেড়ে চলে যাবে। পদোন্নতি পাওয়ার সুযোগ থাকলে পদোন্নতি পেয়ে উপরের পদে উঠে যাবেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে অনুসারী নেতাকে পেছনে ফেলে সামনে চলে আসবে। যদি যাওয়ার সেই পথ খোলা না থাকে, তাহলে অনুসারী নেতার সিদ্ধান্ত, পদক্ষেপ ও কর্মপন্থায় থাকা ভুলগুলোকে মেনে নিতে পারবে না। ফলে নেতা আর অনুসারীর মধ্যে ভিন্নমত বাড়বে, দ্বন্দ্ব কলহ তৈরি হবে; দুর্ঘটনা ঘটবে। তা না হলে গাড়ির ক্ষেত্রে যেমন গতি কমে যাবে, তেমনি অনুসারীরা কাজে-কর্মে উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে। তাই নেতাকে সব সময় নিজ নেতৃত্বের মানোন্নয়নে সচেষ্ট হতে হবে। অন্যথায়, অনুসারীকে হারাতে হবে আর না হয় নিজের পদ হারাতে হবে। এই জন্য আমরা দেখতে পাই, নিজ নেতৃত্বের মানোন্নয়ন না করে একই মানে ও একই পদে দীর্ঘদিন থাকার কারণে গুরু-শিষ্যে তৈরি হয়েছে দ্বন্দ্ব। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গুরু ধরাশায়ী হয়েছে।

আমাদের চারপাশে চোখ রাখলে আমরা অনেক চেয়ারম্যান, মেয়র, এমপির ক্ষেত্রে এ রকম ঘটনা দেখতে পাই। মনে রাখতে হবে, নেতৃত্বের মানোন্নয়নের জন্য নেতৃত্ব নিয়ে পড়াশোনা ও গবেষণার বিকল্প নেই।

নেতার মৌলিক দায়িত্ব

নেতৃত্ব মানে হচ্ছে দায়িত্ব। ইংরেজিতে বলে ‘Leadership is responsibility’। নেতার অনেক দায়িত্ব। দিন শেষে সবকিছুর জন্য দায়ভার নেতার ঘাড়েই বর্তায়। নেতৃত্বের মৌলিক দায়িত্ব তিনটি। যথা-

- লক্ষ্য অর্জন করা।
- ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা।
- অনুসারীর প্রয়োজন পূরণ করা।

নেতৃত্বের এই মৌলিক তিনটি দায়িত্ব একটি আরেকটির ওপর নির্ভরশীল (Interdependent and Interrelated)। আলাদাভাবে এই দায়িত্বগুলো পালন করা সম্ভব নয়। লক্ষ্য অর্জন না করা গেলে ঐক্য ধরে রাখা যায় না। আবার অনুসারীদের চাহিদা পূরণ না করতে পারলে ঐক্য বজায় রাখা যায় না। সেই সাথে ঐক্য বজায় রাখতে না পারলে লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয় না। ফলে অনুসারীদের চাহিদাও পূরণ করা যায় না। পরস্পরছেদী তিনটি বৃত্তের মাধ্যমে এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা স্পষ্ট করা যায়।



লক্ষ্য অর্জন কর

দল, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের লক্ষ্য অর্জন করাই নেতার প্রথম ও প্রধান কাজ। লক্ষ্য অর্জনের ধাপগুলো হচ্ছে—

ক. লক্ষ্য স্থির করা ও লক্ষ্যকে সবার লক্ষ্যে পরিণত করা

কী করতে হবে, কেন করতে হবে- তা সকলের কাছে স্পষ্ট করা। এটা নেতার প্রথম দায়িত্ব। একটা প্রবাদ আমরা সবাই জানি— ‘লক্ষ্যহীন জীবন মাঝিবিহীন নৌকার মতো।’ মাঝির দায়িত্ব হচ্ছে লক্ষ্য স্থির করা এবং সেই লক্ষ্যে নৌকাকে এগিয়ে নেয়া। কিন্তু মাঝি যদি লক্ষ্য স্থির করতে না পারে, তাহলে মাঝি থাকা আর না থাকায় কোনো পার্থক্য নেই। তেমনি লক্ষ্যহীন সংগঠনও হচ্ছে মাঝিবিহীন নৌকার মতো। নেতা যদি লক্ষ্য স্থির করতে না পারেন, তাহলে নেতার আসনে কেউ থাকা, না থাকায় আদতে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ, সেই সংগঠন গতিশীল হবে না। লক্ষ্য স্থির করে নেতার মনের মধ্যে রেখে দিলে হবে না। সবাইকে জানাতে হবে ও তা সবার লক্ষ্যে পরিণত করতে হবে। কেন এই লক্ষ্য স্থির করা হলো, তা খোলাসা করতে হবে। বোঝাতে হবে, এতে প্রত্যেক সদস্যের কী লাভ আছে। তবেই সেটা প্রত্যেকের লক্ষ্যে পরিণত হবে। লক্ষ্য অর্জনের পথে সাময়িক কোনো সমস্যা হলে তা স্পষ্ট করে উপস্থাপন করতে হবে, দীর্ঘ মেয়াদে তার ফলাফল তুলে ধরতে হবে। তা না হলে অনুসারীরা নেতা ও লক্ষ্যের প্রতি আস্থাহীনতায় ভুগবে এবং কাজে-কর্মে উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে।

লক্ষ্য নির্ধারণের সময় কতগুলো বিষয় মাথায় রাখতে হবে—

- **সুনির্দিষ্ট (Specific) :** কী করতে হবে, কী করা হবে- তা যতদূর সম্ভব নির্দিষ্ট করতে হবে। যেমন : ওজন কমানো হবে বললে হবে না। কত কেজি ওজন কমানো হবে, তার নির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে। শুধু দারিদ্র বিমোচন করা হবে বললে হবে না। ঠিক কতজনকে দারিদ্রতা থেকে মুক্ত করা হবে, তার সংখ্যা উল্লেখপূর্বক সুনির্দিষ্ট করে বলতে হবে। তবেই কেবল লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট হবে। লক্ষ্য যত ‘সুনির্দিষ্ট’ (Pin Pointed) হবে, তা অর্জনে তত বেশি সচেষ্ট হওয়া যাবে।
- **অর্জনযোগ্য (Attainable) :** যেখানে লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করা হবে, সেখানকার বিরাজমান পরিস্থিতি লক্ষ্য অর্জনের জন্য সহায়ক হতে হবে। জনবল, অর্থবল ও অন্যান্য

পারিপার্শ্বিক অবস্থা লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল, অর্থবল, যন্ত্রবলসহ আনুষঙ্গিক সবকিছুর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

- **পরিমাপযোগ্য (Measurable) :** লক্ষ্য এমন হতে হবে, যেন সব সময় পরিমাপ করা যায়। লক্ষ্য অর্জনে কতটুকু অগ্রসর হওয়া যায়, তা সহজে বোঝাতে সক্ষম হতে হবে। লক্ষ্য অর্জনের পথে বাধা ও সংকট যেন সহজে উপলব্ধি করা যায়, সেটাও খেয়াল রাখতে হবে।
- **উৎসাহব্যঞ্জক (Motivational) :** লক্ষ্য এমন হতে হবে, যেন তা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করতে সবাই উৎসাহ পায়। লক্ষ্য অর্জিত হলে সবাই কীভাবে উপকৃত হবে, সেটি স্পষ্ট করে বোঝাতে হবে।
- **সর্বসম্মত (Agreed Upon) :** লক্ষ্যটা এমন হতে হবে, যেন তা অর্জনে সবার সম্মতি থাকে। বিশেষ করে লক্ষ্য অর্জনে যারা কাজ করবে তাদের সম্মতি থাকা আবশ্যিক। যদি কারও সম্মতি না থাকে, তবে তথ্য-উপাত্ত ও গঠনমূলক যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে সম্মতি অর্জন করতে হবে।
- **সময় নির্দিষ্ট (Time bound) :** করণীয় কাজ কবে নাগাদ করা হবে, কোন সময়ের মধ্যে শেষ করা হবে- তা সুনির্দিষ্ট করতে হবে। সময় নির্দিষ্ট না হলে কাজে গতি আসবে না। যেমন : কেউ লক্ষ্য স্থির করল, সে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করবে; কিন্তু কবে নাগাদ করবে তা স্থির করলো না। এটাকে আদতে লক্ষ্য নির্ধারণ বলা যায় না। যখন আগামী ২০২১ সালের মধ্যে পিএইচডি সম্পন্ন করা হবে বলে স্থির হয়, তখন তাকে লক্ষ্য নির্ধারণ বলা হয়।

খ. পরিকল্পনা করা

লক্ষ্য স্থির করলেই নেতার কাজ শেষ হয়ে যায় না। লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পনা করতে হবে। সুষ্ঠু পরিকল্পনা না করার অর্থই ব্যর্থতার পরিকল্পনা করা। মনে রাখতে হবে, কোনো পরিকল্পনা শতভাগ বাস্তবায়িত হয় না। এই চিন্তা মাথায় রেখে পরিকল্পনা করতে হবে। লক্ষ্য অর্জনে পরিকল্পনাগুলো নিচে তুলে ধরা হলো-

- কত জনকে কাজ করতে হবে?
- কে, কী কাজ করবে, কতটুকু করবে?

- কেন করবে?
- কখন করবে?
- কাকে সাথে নিয়ে করবে?
- কত টাকা খরচ করবে?
- কী কী উপাদান ব্যবহার করবে?
- প্রয়োজনীয় জনবল, অর্থবল ও যন্ত্রবল আছে কিনা?
- পর্যাপ্ত জনবল, অর্থবল ও যন্ত্রবল না থাকলে তা কোথা থেকে আসবে?
- লক্ষ্য অর্জনের পথে ভেতর ও বাইরে থেকে কোনো প্রতিবন্ধকতা আছে কিনা?
- প্রতিবন্ধকতা কী কী?
- প্রতিবন্ধকতা কখন, কীভাবে, কাকে দিয়ে মোকাবেলা করা হবে?
- কোন সময়ে কাজের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হবে?
- লক্ষ্য অর্জনে কাজ ঠিকমতো এগিয়ে চলছে কিনা তা কীসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে?
- কখন, কীসের ভিত্তিতে লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে বলে ঘোষণা করা হবে বা লক্ষ্য পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হবে?

গ. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা

পরিকল্পনা করার পর আসল কাজ হচ্ছে তা বাস্তবায়ন করা। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য যা যা করতে হবে।

- দায়িত্ব বণ্টন করা : পরিকল্পনা শেষে সবাইকে তার করণীয় দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে হবে। আনুষঙ্গিক উপকরণ সরবরাহ করা বা সংগ্রহের উপায় বাতলে দিতে হবে। সেই সাথে সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগ নেয়ার সীমারেখাও বাতলে দিতে হবে।
- কাজের সূত্রপাত করা : অফিসিয়ালি কাজের সূচনা ঘোষণা করতে হবে।
- সমন্বয় করা : বিভিন্ন কাজ ও কাজের গ্রুপের মধ্যে সমন্বয় করতে হবে।
- সংঘাত নিরসন করা : কাজ করতে গেলে কিছু ভুল বোঝাবুঝি হবে; এমনকী দ্বন্দ্ব-সংঘাতও হতে পারে। এসব দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও ভুল বোঝাবুঝি হলে তা নিরসন করতে হবে।
- অগ্রগতির মূল্যায়ন করা : সময় সময় কাজের অগ্রগতি পরিমাপ করা এবং প্রত্যাশিত অগ্রগতি হচ্ছে কিনা, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

- পুনঃপরিকল্পনা করা : মূল্যায়ন এবং পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনায় সংশোধন করা। সংশোধিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেয়া।
- সমাপ্তি টানা : লক্ষ্য অর্জনের ঘোষণা করা বা প্রকল্প পরিত্যক্ত ঘোষণা করা।

এই কাজগুলো নেতার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু পরিস্থিতির আলোকে নেতাকে এর চেয়েও বেশি দায়িত্ব পালন করতে হতে পারে। যেমন : অনুসারী উদ্যোগী হলে নেতাকে কাজের সূত্রপাত করে দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না। অনুসারীরা অভিজ্ঞ হলে খুব ঘন ঘন অগ্রগতির মূল্যায়নের দরকারও পড়ে না।

ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা

ঐক্য প্রতিষ্ঠায় আসলে আলাদাভাবে কিছু করতে হয় না। যারা লক্ষ্যের সাথে সহমত পোষণ করে কাজ করতে সম্মত হয়, তাদের মধ্যে এমনিতে ঐক্য প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। নেতা যে লক্ষ্য স্থির করেন এবং সে লক্ষ্য যত বেশি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করেন, তত বেশি মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়। তাই লক্ষ্য যত বড় ও মহৎ হবে, তত বেশি মানুষ নেতার পেছনে ঐক্যবদ্ধ হবে। তবে ঐক্য বজায় রাখার জন্য কিছু আচরণবিধি নির্ধারণ করতে হবে এবং সেগুলোর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। কী করা যাবে আর কী বলা যাবে, তা ঠিক করতে হবে এবং সবাইকে জানিয়ে দিতে হবে। ন্যায়বিচার ও ন্যায্য আচরণ নিশ্চিত করতে হবে।

নেতা যখন কিছু মানুষকে বলেন, চলুন সবাই মিলে এই কাজটি করি। তখন যারা কাজটি করার ব্যাপারে একমত হবেন, তারা স্বাভাবিকভাবেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেলেন। তাদের আর বলার প্রয়োজন পড়ে না, চলুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হই। কিন্তু কোনো কাজের কথা না বলে যদি কেউ বলে, চলুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হই, তখন কী হবে। সবাই জানতে চাইবে কেন, কী কাজ করার জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধ হব। সেই কাজ বা লক্ষ্যটা স্পষ্ট না করা পর্যন্ত কিন্তু বাস্তবে কোনো ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে না। ঐক্য হচ্ছে, লক্ষ্য অর্জনের বাই প্রোডাক্ট (উৎপাদ)। আগে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তারপর লক্ষ্য নির্ধারণ নয়। আমাদের আগে কী করতে হবে, লক্ষ্য কী, তা ঠিক করে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমরা কিছু করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হই। ঐক্যবদ্ধ হয়ে কিছু করি না।

অনুসারীর প্রয়োজন পূরণ করা

যখন কোনো লক্ষ্য স্থির করা হয়, তখন সাধারণ মানুষ স্বাভাবিক কারণেই জানতে চায়, ‘কাজটি হলে আমার লাভ কী আর না হলে ক্ষতি কী? এতে কি আমার কোনো চাহিদা পূরণ হবে? আর না হলে কী ক্ষতি হবে?’

মানুষ যদি প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে কোনো লাভ-ক্ষতি না দেখতে পায়, তাহলে সে কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে চায় না। তাই লক্ষ্য নির্ধারণের সময় মানুষের চাহিদার কথা মাথায় রাখতে হবে। যদি মানুষের মনে লাভ-ক্ষতির বিষয়টি স্পষ্ট থাকে, তবে খুবই ভালো। আর যদি না থাকে তবে, লাভ-ক্ষতি স্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে। এই লাভ-ক্ষতির দিক যত বেশি স্পষ্ট করা হবে, মানুষ সেই লক্ষ্য অর্জনে তত বেশি মনোনিবেশ করবে। রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে যেমন এটা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে, তেমনি ব্যবসায় বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।